সবুজ ইস্তাহার

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

সবুজের অভিযান

বর্ষ : ১ | ত্রৈমাসিক সংখ্যা ১ | ডিসেম্বর ২০০৮ | দাম ২ টাকা

পরিবেশ ভাবনার গোড়াপত্তন কবে কীভাবে আরম্ভ হয়েছিল সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হতে পারে, গবেষণা হতে পারে, তবে একটি সত্য আজ পৃথিবীর বুকে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে যে পরিবেশকে নিয়ে ভাবনা চিন্তার দৈন্য আমাদের সভ্যতাকে প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। পৃথিবীর নানান প্রান্তে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা-আন্দোলন আরম্ভ হলেও প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ আন্দোলনকারীদের মধ্যে ভাবনা চিন্তার যোগসূত্র অতি ক্ষীণ এবং পরিবেশ নিয়ে সঠিক, যুক্তিসংগত ভাবনার আধার যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেনি। ফলে পরিবেশ নিয়ে ভাবতে গিয়ে মানবজাতি পরস্পরকে দোষারোপ করছে বা পরস্পরকে অহেতুক সমালোচনা করে পরিবেশ আন্দোলনেরই ক্ষতি করছে।

পাশ্চাত্য দেশে পরিবেশ নিয়ে ভাবনাচিন্তার ফলে যেসব তত্ত্ব উঠে আসছে সেটা অনেক সময় বিকাশশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না বা তৃতীয় বিশ্ব পরিবেশ ধ্বংসের অন্যতম শত্রু পাশ্চাত্য দেশকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েও পরিবেশ বিষয়ক ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে কোন সংগঠিত জনমত গড়তে পারছে না। বিশ্বজোড়া দারিদ্র, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ, অকারণ যুদ্ধ ঘোষণা বা তার প্রস্তুতি ক্রমাগত সভ্যতার সংকটকে পরিবেশগত ভাবে ঘনীভূত করলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্য দিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সর্বগ্রাহ্য নীতি আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত হয়নি। আন্তর্জাতিক আলোচনার টেবিলে বিশ্বের উন্নত বা বিকাশশীল দেশগুলি বহুবার বসলেও তার ফলশ্রুতি বিশ্বের পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও রেখাপাত করেনি।

পৃথিবী জুড়ে অদ্ভুত আঁধার এক, যে আঁধারে পথ চলাটাই অনেকটা কষ্টকর। বহু ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ যুগে যুগে উচ্চারিত হয়েছে ও পরবর্তী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু পরিবেশ সমস্যার সমাধান সূত্র অধরাই থেকে গেছে।

পরিবেশের কথা বলতে গেলে তার আবর্তে পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতি ও সম্পদ অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। সমস্ত প্রজাতি পৃথিবীর সম্পদকে ব্যবহার করেই তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাস পৃথিবীতে লিখেছে ও ভবিষ্যতেও লিখবে। সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও তার ব্যবহারের নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তনের সঙ্গেই মজবুত উন্নয়ন বা গ্রহণযোগ্য পরিবেশ বিষয়টা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই পত্রিকা মূলত পরিবেশ ভাবনার একটা ছোট কোলাজ যার মধ্য থেকে আগামী দিনে হয়তো বেরিয়ে আসবে এমন একটি পরিবেশ-বান্ধব দর্শন যা পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহারের ওপর এক পরিণত ভাবনার জন্ম দেবে। বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন ও স্পর্শকাতর। কিন্তু বেঁচে থাকার এক অদম্য ইচ্ছা মানুষকে শতাব্দী থেকে আর এক শতাব্দীতে টেনে নিয়ে গেছে। ফলত মানুষের ভাবনার ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ এই আস্থা নিয়েই এই পত্রিকার চলা শুরু।

যে শহরে দূষণ হয় না

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

রোজ ট্রামে-বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে যাতায়াত করে আপনি ভাবলেন, একটা গাড়ি কিনলে বেশ হয়। আরামের কথা ভেবে গাড়িটা কিনেও ফেললেন। ফলে শহরে গাড়ির সংখ্যা একটা বেড়ে গেল। শুধু একটা বাড়ল এমন নয়। অনেকেই একই রকম ভাবলেন এবং গাড়ি কিনে ফেললেন। স্বভাবতই গাড়ি বাড়ল শহরে। গাড়ি বাড়লেও সেই অনুপাতে রাস্তা কিন্তু বাড়ল না। ফলে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে আপনি ফের গরমে জেরবার! দেরি তো হচ্ছেই আর তার সঙ্গে উপরি হিশেবে জুটছে বাসের কালো ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া খেলে আর গরমে ঘেমে- নেয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন, গাড়িতে এয়ার-কন্ডিশনার না লাগালে কোনোমতেই আর চলছে না। আপনি তো ঠাণ্ডা হলেন কিন্তু বাইরেটা?

বাইরে বিভিন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি থেকে বেরোনো গরম হাওয়ায় গরম গেল বেড়ে। গাড়ির সংখ্যা বাড়ায় বাড়ল জ্যাম, বাড়ল বায়ুদূষণ। প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিরা ভাবলেন, জ্যামের ফলে ঢিমে তালে গাড়ি চলায় যেহেতু গাড়ির জ্বালানি বেশি খরচ হচ্ছে তাই এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে গাড়ি দ্রুত চলতে পারে। তার জন্য দরকার আরও রাস্তা তৈরি করা। কিন্তু রাস্তা তৈরির জায়গা নেই। ফলে দ্রুত গাড়ি চলার জন্য তৈরি হল উড়াল পুল। সেখানে গাড়ি হুস করে উঠল বটে কিন্তু রাস্তার অভাবে নামার সময় আবার ভিড়, আবার জ্যাম! সমাধান তো হলই না, উল্টে এই সেতু তৈরি করতে গিয়ে বহু গাছ কাটা পড়ল। অনেক মানুষের বাড়ি এবং জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন দোকানও ভাঙা পড়ল।

যে ঘটনাগুলোর কথা বললাম এর একটাও কল্পনা নয়। আমাদের শহর এখন এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই চলছে। গাড়ি বাড়ছে। আকাশ ছোঁয়া বাড়ি বাড়ছে। মাটির তলার জল কমছে। আবার প্লাস্টিক-পলিথিনের ব্যবহার বাড়ছে। যেখানে সেখানে প্লাস্টিক আবর্জনার স্তূপ! নর্দমার মুখ আটকে যাচ্ছে, একটু বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট জলের তলায়। আমরা নিয়ম করছি, পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করা চলবে না। অর্থাৎ একটা করে দূষণের সমস্যা সামনে আসছে আর আমরা তা সামলানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু সবটা মাথায় রেখে কি আমরা এমন কোন পরিকল্পনা নিতে পারি না যাতে দূষণ হবেই না? বা, এত যে শিল্প গড়ে উঠছে, এমন কোন শিল্প কি গড়ে তোলা যায় না যেখানে শুধু দূষণরোধী

এর পর দুইয়ের পাতায়

একের পাতার পর

জিনিসপত্র তৈরি হবে?

আসলে বিশ্বজোড়া উন্নয়নের যে গতিমুখ তাতে শহরবাসীর সংখ্যা বাড়ছে, আরও বাড়বে। যেহেতু শহরে ভোগের সুযোগ বেশি তাই পাল্লা দিয়ে বাড়বে দূষণ আর বর্জ্য। আর সেজন্যই ভাবনা শুরু হচ্ছে এমন শহরের যেখানে দূষণ হবে না। এরকমই এক শহর গড়ে তোলা হচ্ছে চিনের শাং হাইয়ের কাছে ডোংটনে। জলাভূমি আর পাখিরালয়ের নিকটবর্তী এই নতুন শহরে কোন কার্বন নির্গমন হবে না। মানুষের শক্তির চাহিদা মিটবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস থেকে। থাকবে না মোটরগাড়ি। তার বদলে চলবে বাই-সাইকেল, দূষণমুক্ত বাইক আর হাইড্রোজেন চালিত নৌকা। সেই শহরের অধিবাসীদের জন্য খাদ্য উৎপাদনও হবে ওখানেই। পরিবেশবান্ধব এই শহরের পরিকল্পনাকে এক কথায় বলায় যায়, আমাদের গ্রহকে বাঁচানোর লক্ষ্যে এক সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু আমাদের দেশে, আমরা এমন শহর গড়ে তুলব কবে?

সবুজ শক্তি : আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয় কেন

ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়

হোমো স্যাপিয়েন্স নামের প্রজাতিটি যেদিন প্রথম নাম লিখিয়েছিল জীববিজ্ঞানের পাতায়, সেদিন পৃথিবীর অন্য জীব প্রজাতির সঙ্গে তার তফাত ছিল সামান্যই। অন্যান্য অবলা জীবের মত এরাও গাছগাছালি থেকে সংগ্রহ করত খাদ্য, নদীতে মুখ ডুবিয়ে মেটাত তৃষ্ণা, জৈবিক নিয়মে ঘটাত বংশ বিস্তার। অবশেষে কাল পূর্ণ হলে মৃত্যু হত তাদের, হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে, নতুবা অন্য পশুর আক্রমণে। বাঁচার জন্য এরা নিরন্তর সংগ্রাম করত পরিবেশের সাথে। শত্রুর তালিকাটি দীর্ঘায়িত করেছিল অন্যান্য হিংস্র পশু কিংবা অন্য গোষ্ঠীর মানুষ। কিন্তু তফাতটা ঘটে গেল সেদিনই, যেদিন মানুষ প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখল, শক্তিকে বেঁধে ফেলল আপন হাতের মুঠোয়। আর ভয় নয়, সংগ্রাম নয়, শোষিতও নয় —মানুষই ধীরে ধীরে হয়ে উঠল সমগ্র জীব-প্রজাতির তথা প্রকৃতির শাসক।

প্রথম দিকে মানুষ শক্তির ব্যবহার করত মূলত রান্না করতে, অন্ধকারে আলো জ্বালাতে আর শীতের সময় উত্তাপ সৃষ্টি করে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে। শুকনো পাতা, গাছের ডাল এ সবই ছিল তখনকার শক্তির উৎস। এরপর যখন ইট তৈরি করতে কিংবা ধাতু ব্যবহার করতে শিখল মানুষ, তখন প্রয়োজন হল আরও অনেক বেশি শক্তির। আর ছোট ছোট ডালপালা নয়, হাত পড়ল বড় বড় গাছে। আজ থেকে প্রায় ১০-১২ হাজার বছর আগেই মানুষ পশুশক্তিকে ব্যবহার করেছে কৃষিক্ষেত্রে। বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নৌকা চালিয়েছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ। এ-ও প্রায় ৫-৬ হাজার বছর আগেকার ইতিহাস। ২-৩ হাজার বছর আগেই তৈরি হয়ে গেল বায়ুকল। জল কল থেকে শক্তি উৎপাদনও শুরু হয়েছে নরম্যানদের সময় থেকেই। কিন্তু শক্তির উৎস ও 'জন প্রতি শক্তির ব্যবহার'-এর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা অনেক পরে, বলতে গেলে আধুনিক পৃথিবীতে। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে জেমস্ ওয়াট স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর থেকেই শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস হিশেবে স্থান নেয় কয়লা —যদিও কয়লার ব্যাপক ব্যবহারের সূচনা অনেক পরে, ১৯ শতকের গোড়ার দিকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কিছু বছর পর্যন্ত কয়লাই তার শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি ধরে রেখেছিল। এক সাথে খনিজ তেল কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারও তখন অজানা ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকেই শক্তির ক্ষেত্রে শুরু হল আর এক নতুন অধ্যায় যাকে আমরা Era of oil বা তেল যুগ বলতে পারি।

এই সময় থেকেই সভ্যতার চাকার গতি বেড়ে গেল বহুগুণ। গড়ে উঠতে শুরু করল নতুন সব কলকারখানা। মাথা উঁচু করে দাঁড়াল বড় বড় বহুতল। দ্রুত থেকে দ্রুততর হল মানুষ। আর পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হতে হতে কেমন করে যেন হাতের মুঠোয় চলে এল। ফলে মানুষ হয়ে গেল শক্তির দাস। প্রতিদিন টন টন কয়লা পুড়তে থাকল। দ্রুত ফুরোতে থাকল তেলের ভাণ্ডার। তৈল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর নতুন ধনিক শ্রেণি হিসেবে দেখা দিল। তেল নিয়ে শুরু হল নানান কূটকচালি সারা পৃথিবী জুড়ে। একদা যে আদিম মানুষ খাদ্যের জন্য লড়াই করেছে পশুর সঙ্গে , সেই মানুষই নয়া যুদ্ধে মেতে উঠল তেলের খনি দখলের জন্য আরও বর্বরোচিত ভাবে।

কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে গেছে এক বড় বিপর্যয়, সকলের অজান্তে। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা দেখলেন প্রকৃতির বেশ কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন —কী আবহমণ্ডলে, কী জৈববৈচিত্র্যে। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, দৈনন্দিন শক্তির চাহিদা মেটাতে যে টন টন কয়লা ও তেল পোড়াচ্ছে মানুষ, তাদেরই দহনে সৃষ্টি হচ্ছে কার্বনডাইঅক্সাইড, কার্বনমনোঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফারডাইঅক্সাইড বা মিথেন- এর মত ভয়ঙ্কর গ্যাস। ফলে তরতর করে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা, গলে যাচ্ছে মেরু অঞ্চলের বরফ, দ্রুত অবলুপ্ত হচ্ছে জীবকুল। সর্বোপরি, এই সব বিষাক্ত গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে মানুষের শরীরে ঢুকে সৃষ্টি করছে অজানা সব রোগের। ক্রমশ শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। কিন্তু সভ্যতা যে উচ্চতায় দাঁড়িয়ে সেখানে কোনও ভাবেই সম্ভব নয় শক্তির ব্যবহার কমানো বা শক্তি উৎপাদন বন্ধ করা। অগত্যা বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু শক্তির উৎসের সন্ধান শুরু করলেন, যেগুলি একদিকে মানুষের চাহিদা মেটাবে অথচ কমাবে প্রকৃতির অবনমনের পরিমাণ। পাওয়াও গেল। এরকম কিছু শক্তি। এদের নতুন নাম করণ হল সবুজ শক্তি। তবু দুঃখের বিষয়, আজও সেই সমস্ত শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনার প্রয়োগ হল সামান্যই। তাই বিগত বছরেও পৃথিবীর মোট শক্তি উৎপাদনের ২১.৭ শতাংশ উৎপাদিত হয়েছে কয়লা থেকে, ৩৭.৫ শতাংশ খনিজ তেল থেকে, ২৪ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। এই পরিবেশ সচেতনতার বাজারেও আমরা ২০০৭ সালে কয়লা পুড়িয়েছি ৬,৬৩২ টন সারা পৃথিবী জুড়ে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এত সম্ভাবনা, এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সবুজ শক্তি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হল না কেন?

আসলে সবুজ শক্তির উৎসগুলি স্থানীয় ভাবেই শক্তির চাহিদা মেটাতে সক্ষম। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষও জানেন না যে কেন তাঁরা শক্তি সংরক্ষণ করবেন, কেনই বা করবেন সবুজ শক্তি ব্যবহার। কোন্ জায়গা থেকে কী ভাবে তাঁরা পেতে পারেন এই শক্তি তা-ও তাঁদের অজানা।

এর পর তিনের পাতায়

দুয়ের পাতার পর

এমনকী এগুলি ব্যবহারেও তাঁদের সংশয় রয়েছে।

সবুজ শক্তির উৎপাদনে বেশ খরচ। এর ইউনিট প্রতি খরচ এত বেশি হয় যে তা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। সবুজ শক্তি উৎপাদনে আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে সরকারি ভর্তুকি বা ব্যাঙ্কের ঋণ লাভের পদ্ধতিও বেশ গোলমেলে। এমনকী উপযুক্ত শিক্ষাদানের অভাবে সবুজ শক্তি উৎপাদনের জন্য দক্ষ শ্রমিকও মেলে না। সবুজ শক্তির ব্যাপারে সরকারি নীতিও বিমাতৃসুলভ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। আজ বহু দেশেই সরকার চিরাচরিত শক্তি উৎপাদনে যে ভর্তুকি বা ছাড় দেন, সবুজ শক্তির বেলায় তা দেন না। সবুজ শক্তির উৎপাদনগত প্রযুক্তি আজও গবেষণার স্তরে। এই শক্তি দীর্ঘ সময় ধরে সঞ্চয় করে রাখাও যায় না। বায়ু থেকে শক্তি উৎপাদন প্রাকৃতিক কারণেই কিছু নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়েই সম্ভব। সৌরশক্তির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা **এস পি ভি** (সোলার ফটোভোল্টাইক কোষ)-এর অস্বাভাবিক মূল্য। আসলে এই কোষগুলি তৈরিতে যে সিলিকন ব্যবহৃত হয়, তার দাম এতই বেশি যে কোষগুলির দামে তার প্রভাব পড়ে। কোষগুলি কোন কারণে খারাপ হলে তার মেরামতি সহজসাধ্য নয়। প্রতিদিন ব্যাটারি পরিচর্যাও খরচ সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য। এছাড়া কোষগুলির বড় আকারও এদের জনপ্রিয়তার অন্যতম বাধা। আবার সৌরশক্তি উৎপাদনে কিছু প্রাকৃতিক কারণ, যেমন — ভূমির ঢাল, অক্ষাংশ ইত্যাদিও অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ছোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরিতে প্রারম্ভিক খরচ খুব বেশি। ঋতুভিত্তিক জলপ্রবাহের উপর নির্ভরশীলতা, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে চাহিদার অভাব প্রভৃতির কারণে এগুলির বহুল প্রচলন সম্ভবপর নয়। এছাড়া নদীবাঁধ বিভিন্ন পরিবেশীয় সমস্যার ও জন্ম দেয়। আর একটি সবুজ শক্তি জৈবগ্যাস। কিন্তু ঘরে ঘরে এটি জনপ্রিয় হচ্ছে না মূলত আর্থিক কারণে। সামাজিক ভাবে জৈবগ্যাস তৈরি করতে গেলে পশুমলের অভাবও দেখা যায়। সামাজিক জৈবগ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র তৈরিতে বেশ খরচ পড়ে। ফলে বিনিয়োগকারী সহজে মেলে না। ভূগর্ভস্থ তাপ থেকে শক্তি উৎপাদন সীমাবদ্ধ কিছু স্থানেই কেবল সম্ভব। জোয়ার-ভাটা থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রধান বাধা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া শক্তি উৎপাদন করতে না পারা। বিভিন্ন ধরনের নাগরিক আবর্জনার কে যথাযথ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার অভাব থাকার জন্য, আবর্জনা থেকে শক্তি উৎপাদনও সহজ নয়। কাঠ পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদনের ব্যবহার অতি প্রাচীন। এর জন্য চাই প্রচুর পতিত জমি যেখানে রোজ লাগানো হবে নতুন গাছ। নগরায়ন, শিল্পায়ন বা এক কথায় উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রতিদিনই বনভূমি কাটা পড়ছে। তাই বিংশ শতকের গোড়ায় যেখানে পৃথিবীতে ৫ লক্ষ হেক্টর বনভূমি ছিল, একবিংশ শতকে এসে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৯ লক্ষ হেক্টর। এভাবে চললে পৃথিবীর বুকে নতুন মরু মানচিত্র খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হবে।

খুব বেশি পরিমাণে শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার করতে গিয়ে, বিশেষ করে জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহারের ফলে, আমরা এক ভয়ংকর পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। বিপন্ন হয়ে পড়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সমগ্র জীবজগৎ। সার্বিক এই বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা পেতে সবুজ শক্তি উৎপাদনকে গুরুত্ব দিতেই হবে। নইলে একমাত্র প্রাণময় এই গ্রহটিকে আর রক্ষা করা যাবে না। আর দিবাস্বপ্নের মতোই অধরা থেকে যাবে আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাও।

পরমাণু বোমা বিরোধী গণ আন্দোলন

দীপক কুমার দাঁ

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন দেখালেন ভর ও শক্তির সম্পর্ক সূত্র $E = mc^2$। জানা গেল, বস্তুর মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ লুক্কায়িত পারমাণবিক শক্তি। পদার্থ বিজ্ঞানীরা উৎসাহিত হলেন। গোটা ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থরাজি সৃষ্টি হয়েছে শক্তি থেকে। এবং এখনও তা হচ্ছে। আদিতে এই শক্তি এল কোথা থেকে? এর উত্তর এখনও অজানা।

আইনস্টাইন বলেছিলেন, প্রযুক্তির কারণে মানুষ কখনও এই শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগে সক্ষম হবে না। ১৯৩৯ জার্মানিতে অটো হান, লিজে মাইটনার প্রমাণ করলেন, পরমাণু ভাঙা যায় (Fission)। এর থেকে বেরিয়ে আসে মুক্ত নিউটন। তা দিয়ে আবার পরমাণুর কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ। নিমেষে বিপুল শক্তির মুক্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমেরিকা ও মিত্রশক্তির ধারণা হল জার্মানি পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলেছে। বিজ্ঞানীরাও সহমত পোষণ করলেন। আমেরিকায় শুরু হল পরমাণু বোমা তৈরির গোপন সুবিশাল কর্মকাণ্ড। দু'জন বিজ্ঞানী ছিলেন এর নেতৃত্বে — এনরিকো ফের্মি, রবার্ট ওপেনহাইমার। বোমা তৈরি হয়ে গেছে। জার্মানি, জাপান যুদ্ধে পর্যুদস্ত। তবু ৬ ও ৯ অগাস্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলা হল - ফ্যাটম্যান ও লিটিল বয়-কে। শুধুমাত্র ধ্বংসলীলা পরীক্ষা করার জন্য। এমন নারকীয় যুদ্ধোন্মাদ ধ্বংস প্রবৃত্তির ভয়াবহ নজির একান্তই বিরল। সভ্যতার কলঙ্ক।

পৃথিবী জুড়ে প্রতিবাদ উঠল। ১৯৮০ অবধি আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া ব্যাপকভাবে পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরির প্রস্তুতি বাড়িয়েই গেছে। সেই সঙ্গে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চিন, ভারত, পাকিস্তান, কোরিয়া এমন ১৫/২০টা দেশ পরমাণু বোমা তৈরিতে শক্তিধর, এমনটাও জানা গেছে। এসেছে এন পি টি চুক্তি। অনেক দেশ স্বাক্ষর করলেও ভারত এখনও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

পরমাণু বোমা - হাইড্রোজেন বোমার শক্তি আজ বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রীয় চালিকা শক্তি বিশেষ। যে দেশ পরমাণু শক্তিতে যত বেশি বলীয়ান, তার মাতব্বরি - দাদাগিরি তত বেশি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যাবতীয় কৃৎকৌশল ব্যবহার করে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি অতি উন্নত যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করেছে। কম শক্তির দেশগুলি এই অস্ত্র কিনে নিজেদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে মজবুত করে। এতে যুদ্ধ ব্যবসা বাড়ে এবং আর্থিক লাভও অতি উগ্রভাবে সক্রিয়।

এর সঙ্গে শুরু হয়েছে গোপন জঙ্গি আক্রমণ। পৃথিবীর সর্বত্র ছোটবড় অসংখ্য রাজনৈতিক - ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে যাদের হাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি-বোমা-বন্দুক-কামান ইত্যাদি।

যুদ্ধ ছোট বড় যেভাবেই ঘটুক, তাতে পরিবেশের বিপদ সর্বাধিক। পরমাণু যুদ্ধের বিপদ ও ভয়াবহতা একেবারেই স্বতন্ত্র। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ

এর পর চারের পাতায়

তিনের পাতার পর

ঘটিত বিপদ একটি দীর্ঘকালীন স্থায়ী সংকট। তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত কারণে নানাবিধ শারীর-বিপাকীয় কাট ব্যাহত হয়। ক্যানসার রোগের অন্যতম প্রধান কারণ এই বিকিরণ। চোখ, চর্ম, কিডনি, লিভার, হাড়, ফুসফুস - এসবও আক্রান্ত হতে পারে - যার সম্ভাব্য পরিণতি - নিশ্চিত মৃত্যু। হিরোসিমা - নাগাসাকির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতির সামগ্রিক ভয়াবহতা বিরাট আতঙ্ক বিশেষ। পৃথিবীর দুটি শক্তিধর দেশ যে পরিমাণ পরমাণু বোমার মশলা মজুত করেছিল, তাতে সামান্য ভুলভ্রান্তি ঘটলে এই পৃথিবীর জীবসম্পদের ক্ষতির অন্ত থাকবে না - এমন প্রমাদও অনেকে গুনেছিলেন। এই বিষয়ক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে ছোটোখাটো বিপদও (চের্নোবিল ইত্যাদি) কম হয়নি। গোপনীয়তার সুকঠিন বেড়া জাল ভেদ করে যেটুকু জানা গেছে তার পরিমাণও বিশাল।

ভারতের যদুগোড়ায় (বিহার) ইউরেনিয়াম খনি সংক্রান্ত কাজের জন্য স্থানীয় অনেক মানুষ ও শিশু আক্রান্ত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানী এইচ জে ভাবার নেতৃত্বে ভারতীয় পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয়। এরপর ধাপে ধাপে ভারত পরমাণু শক্তিতে এগিয়ে গেছে। ১৯৭৪, ১৯৯৮ বিস্ফোরণ এর অন্যতম প্রতিফলন। এশিয়ার অন্যতম নিকট প্রতিবেশী চিন ভারতের থেকে এই বিষয়ে অনেকটাই এগিয়ে। এজন্য ভারত চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

পরমাণু শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন - একাজ শুরু হয়েছে ৫০-এর দশকের গোড়া থেকেই। অনেক বিজ্ঞানীদের মত, পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন-শক্তির জোগান সুনিশ্চিত করতে একটি সুস্থিত প্রয়াস। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল একবার বলেছিলেন, 'পরমাণু শক্তি দিয়ে বিশ্বের শক্তি চাহিদার পূরণ ঘটানো সম্ভব' (১৯৭০)। পাশাপাশি, বিশ্বের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা এর সম্পর্কে নানা সংশয় প্রকাশ করেছেন।

প্রাথমিক ভাবে এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বেশি। প্রযুক্তির জটিলতা কম নয়। ইউরেনিয়ম জ্বালানির (ইউ-২৩৫) স্বল্পতাও একটা সঙ্কট। বিপদের ঝুঁকি প্রতিপদে। তেজস্ক্রিয়-বর্জ্য জমা করা হবে কোথায়? এটা একটা বড় রকমের মাথাব্যথা। যে সব কর্মী-বিজ্ঞানী-ইঞ্জিনিয়াররা এই সব কেন্দ্রে কাজ করবেন, তাদের বিকিরণ ঘটিত বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া একেবারে নিরামিষ নয়। এর মাধ্যমে পরমাণু বোমা তৈরির মশলাও গোপনে সংগৃহীত হয়। সবাই করে। তাই পরমাণু শক্তি-নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনেকে বিরোধিতা করছেন। দীর্ঘস্থায়ী মানব কল্যাণ ও পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্য সম্পদের সুস্থিত জীবনক্রিয়ায় পরমাণু শক্তির দ্বারা সৃষ্ট বিপদ একটি বড় দুর্ভাবনা।

বিজ্ঞান মানুষের জন্য। মানুষ ঠিক করবে এর ব্যবহারের নীতি ও পরিকল্পনা। পৃথিবীর সব প্রান্তে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মুক্তমনের মানুষেরা এক হয়ে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সামিল হয়েছে। জনবিজ্ঞান আন্দোলন (People's Science Movement) আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়াস। সর্বসাধারণের জীবনযাত্রাকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভাবনা।

ভারতের নানা প্রান্তে পরমাণু শক্তির ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে জনচেতনা বাড়াতে নানা প্রয়াস বিগত ৩০-৩৫ বছর যাবৎ সক্রিয়। সাম্প্রতিক আমেরিকার সঙ্গে 'পরমাণু চুক্তি' এই বিপদের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন, জনবিজ্ঞান আন্দোলন একটি সক্রিয় কর্মপ্রয়াস। বহু সংগঠন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই কর্মপ্রয়াসে সংযুক্ত। হিরোসিমা (৬ অগাস্ট) ও নাগাসাকি (৯ অগাস্ট) দিবসে রাজ্যের নানা প্রান্তে বহু গণ-কর্মসূচি রূপায়িত হয়ে থাকে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় জন সচেতনতা বাড়াতে লেখালিখির প্রয়াসও অব্যাহত। বাংলা ভাষায় প্রচারিত বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ে বহু রচনা এই সময় কালে (১৯৭০-২০০৮) প্রকাশিত হয়েছে। সমৃদ্ধ লিটিল্ ম্যাগাজিনের পাতায় এবং অন্য ধরনের রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সমাজভাবনা বিষয়ক পত্র-পত্রিকার পাতায় বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেছেন বিশিষ্টজনেরা।

পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে মাঝেমধ্যে কথা উঠলেও, এখনও তার কোন কার্যকরী প্রয়াস গড়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে সম্মিলিত গণপ্রয়াস যে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়েছে, তা মানতেই হয়।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিজ্ঞান প্রকাশনা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে একটি মূল্যবান কর্মকাণ্ড। এই কাজ যত বেশি প্রসার লাভ করে তত ভাল। যুদ্ধ পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানুষের জন্য সুস্থ সমাজ, সুস্থ জীবন পরিবেশ রচনায় এই প্রয়াস ব্যাপক জনসমর্থন দাবি করে।

শিল্প ও কৃত্রিম বন

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভিদের অবদান অপরিসীম। জীবনধারণের জন্য আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। উদ্ভিদ বিপরীত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের প্রয়োজনীয় অনুপাত বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাই আমাদের প্রয়োজনেই বৃক্ষ নিধন রোধ করা এবং বৃক্ষরোপনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

গত দুই শতাব্দী ধরে শিল্পে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে শহরের বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। ফলে বসবাসের জন্য জমির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সেই চাহিদা মেটাতে প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে বনাঞ্চল। ফলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে বিপর্যয়।

বনজ সম্পদগুলির মধ্যে অন্যতম সম্পদ কাঠ। জ্বালানি হিসেবে বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহ তো আছেই, এছাড়াও কোনো কোনো দেশে অধিকাংশ শিল্প গড়ে উঠেছে এই বনজ সম্পদটির উপর নির্ভর করে। ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদের বেশির ভাগই কাগজ শিল্প ও প্লাইউড বা ভেনেস্তা কর্ক শিল্পের উপর নির্ভরশীল। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য বহু দ্রব্য সামগ্র তৈরি হচ্ছে বনসম্পদ কাঠ দিয়ে। যদিও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষের ফলে বহু কৃত্রিম জিনিস আবিষ্কার হয়েছে যা বর্তমানে বনজ

এর পর পাঁচের পাতায়

চারের পাতার পর

দ্রব্যের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে অনেকের মনে হতে পারে যে মানুষের কাছে বনজ সম্পদের চাহিদা ইদানিং বুঝি দিন দিন কমে আসছে। কিন্তু পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে। ১৯৫০ সালে পৃথিবীতে যেখানে ১.৫ বিলিয়ন ঘন মিটার কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমানে সেই ব্যবহার বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় তিনগুণ।

একদিকে বৃক্ষ নিধন অন্যদিকে বৃক্ষকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের কারণে তৈরি হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড ইত্যাদি বিষাক্ত গ্যাস, যা গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে পরিচিত। আজ সবারই জানা যে এরই প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাবে আগামী পঞ্চাশ বছরে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাবে। সমুদ্রের জল বেড়ে যাবে। সমুদ্রের কাছাকাছি বহু দেশ তলিয়ে যাবে।

গ্রিন হাউস এমন সমগ্র বিশ্বের সমস্যা। এই সমস্যা মেটানো সম্ভব একমাত্র বৃক্ষ নিধন রোধ করে এবং নতুন বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে। বৃক্ষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ওত প্রোতভাবে জড়িত। সূর্য রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে যেমন ওজন স্তরের প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন বৃক্ষরাজি তথা বনাঞ্চলের। বাতাসের বেগের তীব্রতা, বা সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় থেকেও রক্ষা করতে পারে এই বৃক্ষরাজি। আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতেও বনভূমির অবদান অনস্বীকার্য। ভূমির ক্ষয় রোধেও বৃক্ষের অবদান প্রশ্নাতীত। কাজেই এসব বিবেচনা করে প্রতিটি দেশের প্রতিটি নাগরিককে বৃক্ষ নিধন রোধে এবং বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

ইদানিং উন্নত দেশগুলি বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে এখনও সে মাত্রায় সচেতনতা লক্ষ করা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলন্ডে প্রাকৃতিক বন প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু বিগত শতাব্দীর মধ্যেই বন সৃজনের মাধ্যমে তারা সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলেছে। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলির চিত্রটা অন্যরকম। সেখানে এখনও উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ হচ্ছে বনের সংহার।

এক সময় ধারণা ছিল শিল্পাঞ্চলের প্রসার মানেই বনাঞ্চলের বিনাশ। বর্তমানে অবশ্য এ ধারণা পাল্টাচ্ছে। এখন বহু দেশই বুঝেছে যে শিল্পের সঙ্গে বনের কোনো বিরোধ নেই। শিল্প এবং বনে সহবাস সম্ভব। শিল্প এলাকার আশেপাশে বনসৃজনের ফলে যে সুফল পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠেছে। এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এক হেক্টর পিচ বন এক বছরে প্রায় ৬৮ টন ময়লা বায়ু থেকে পরিষ্কার করতে পারে। বাতাস থেকে ধুলো ময়লা শুষে নেবার ক্ষমতা পাইন গাছেরও আছে। এক হেক্টর পাইন বন বছরে প্রায় ৩৬ টন ধুলো ময়লা শুষে নেয়। রোগ জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রেও গাছের যে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে তা আজ পরীক্ষিত সত্য।

প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে বায়ুতে যে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে তা পূরণ করতে সমর্থ এই সব কৃত্রিম বন। মানুষের সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে বনাঞ্চলের সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে রাশিয়ায় শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে গড়ে তোলা হচ্ছে 'সবুজের প্রাচীর'। উপযুক্ত বৃক্ষরাজি ও গুল্মের সৃজনে মনুষ্য সৃষ্ট এই সবুজায়ন হারিয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক বনের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম।

সভ্যতার অগ্রগতিকে আজ আর অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় শিল্পাঞ্চল প্রসারের প্রয়োজনীতাকে অস্বীকার করা। বনজ সম্পদের ব্যবহারও বন্ধ করা যাবে না। এর ফলে প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের যে ক্ষতি হয়েছে বা হবে তা পূরণ করতে হবে কৃত্রিম বনাঞ্চল সৃষ্টি মাধ্যমে।

বিজ্ঞান মনস্কতা - কয়েকটি প্রশ্ন

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। বিজ্ঞান চর্চা বলতে শুধুমাত্র মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা নয়। মৌলিক বিজ্ঞানের পাশাপাশি কৃষিবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান এমনকী সমাজ বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে চর্চা চলছে।

এই বিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে। কখনও শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের মাধ্যমে। কখনও সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, বই-এর মতো গণ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে। আবার কখনও বক্তৃতা বা আলোচনা চক্রের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান জ্ঞাপন বা বিজ্ঞান প্রসার কিংবা প্রচারের কাজ ঘটে থাকে।

এই বিজ্ঞান প্রচার বা প্রসারকে গবেষকরা 'বিজ্ঞান আন্দোলন' বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এখন একটা প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি হয়েছি। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। ভারতবর্ষ নয়, আমরা আজ বরং পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান প্রসার, প্রচার কিংবা বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব।

আসলে পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে আলোচনা উঠলেই একটা প্রশ্ন সব সময়ই ঘোরা ফেরা করে, যে আজকের তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানুষ কতটা বিজ্ঞান সচেতন হয়েছেন!

কতগুলো উদাহরণ দেওয়া যাক। আজকের দিনের যুবক বা যুবতী বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেছেন; অথবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা উচ্চপদে চাকুরি করেন আর নিজেকে আধুনিক বা বিজ্ঞান মনস্ক মনে করেন। যদি প্রতি রবিবারের সংবাদপত্রগুলো লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সংবাদপত্রের ক্রোড় পত্রগুলির সিংহ ভাগ দখল করে রয়েছে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন। যার শতকরা ৯৯ শতাংশ বিজ্ঞাপনদাতা রাশিফল এবং জ্যোতিষ চর্চায় বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয়, এই বিজ্ঞাপনগুলোর প্রায় ৮০ শতাংশ আধুনিক উচ্চশিক্ষিত পরিবারের দেওয়া। পদার্থবিদ্যা বা মহাকাশ বিজ্ঞানের মতো বিষয়ের লোকেরাও রাশিফল চর্চা, ঠিকুজি-কুষ্ঠী ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। প্রশ্ন চিহ্ন এখানেই। বিজ্ঞান আন্দোলন কি তাহলে দিশা হারিয়েছে?

যখন পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রি করে বহু মানুষ গণেশের মতো পাথরের মূর্তিকে দুধ খাওয়াতে যান, তখনই 'বিজ্ঞান আন্দোলন' থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি আজও অন্ধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী। কথায় বার্তায় অতি আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করলেও পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজ আদৌ আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যতই 'ধূমপান' নিয়ে সরকারি আইন বা বিজ্ঞাপন হোক - ভবি ভোলবার নয়। সময়-অসময়ে যত্রতত্র ধূমপান নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি তো করছেই, এমনকী পরিবেশ দূষণেও নিজেদের স্বাক্ষর রাখছে। নিজেদের আত্মবিশ্বাসের থেকে অলৌকিকতায় বিশ্বাসী এই যুব সমাজের পাশে বিজ্ঞান আন্দোলনের ঢেউ কি আদৌ পৌঁছেছে? প্রশ্ন চিহ্ন

এর পর ছয়ের পাতায়

এখানেও।

বিজ্ঞানকে সমাজমুখী আর সমাজকে বিজ্ঞানমুখী করাই বিজ্ঞান সচেতন মানুষের ধর্ম। সে কথা মাথায় রেখেই ৭০-এর দশকে তৈরি হতে থাকে নানা বিজ্ঞান ক্লাব। সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞান সচেতনতা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সংগঠিত করেছিল 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র' বা 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সায়েন্স ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন'-এর মতো প্রতিষ্ঠান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ক্লাবগুলো তাদের আন্দোলনের গতি হারিয়েছে বলে অনেকেই মনে করেছেন। আবার বিজ্ঞান আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর কাজের সমন্বয় চাই। কিন্তু কী ভাবে? সে নিয়েই সম্প্রতি নদিয়ার চাকদহে যুগিয়া ভুবন মোহিনী বিদ্যামন্দিরে প্রায় ৫০টি বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন বিজ্ঞান আন্দোলনের দিশা ও কর্মসূচি সন্ধানে। আলোচনা বিস্তর হল। বিস্তার লাভ করল কাজের গণ্ডি। কিন্তু ঘুরে ফিরে একটাই প্রশ্ন — সবুজ তাজা কচি প্রাণগুলো বিজ্ঞানের থেকে অবিজ্ঞানকে অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করছে। তাহলে কি বিজ্ঞান আন্দোলনের পথ ভুল? নাকি অবিজ্ঞান প্রচারকরা বিজ্ঞান প্রচারকের থেকে জন সংযোগটা ভাল বোঝেন! প্রশ্ন চিহ্ন এখানেও।

টুকরো খবর

জলবায়ু পরিবর্তন মানবাধিকারের অন্তর্গত : জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সরকারিভাবে মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হল। রাষ্ট্রসংঘের **হিউম্যান রাইটস্ কাউন্সিল** এ বছরের ২৮ মার্চ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বলা হয়েছে যে, উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব মানুষেরা তাদের ঘর-বাড়ি, কাজকর্ম হারাচ্ছেন। তাই এদের বিষয়টিকে অবশ্যই মানবাধিকারের দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ যেমন - মালদ্বীপ, কোমোরস, তুভালু, মাইক্রোনেশিয়া এবং অন্যান্য নিচু এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ছেন প্রায় প্রতি বছর। আবার আফ্রিকার কিছু দেশে দেখা দিচ্ছে খরা ও বাড়ছে মরুভূমি। এই দু'রকম অঞ্চলের মানুষই পড়ছেন চরম বিপন্নতার মুখে। এইসব দেশের কথা ভেবেই রাষ্ট্রসংঘের হিউম্যান রাইটস্ কাউন্সিল জানিয়েছে পরবর্তীকালে এই মানবাধিকার ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশদে সমীক্ষা করা হবে।

বাতাসে কার্বন কমাতে গোবর : বাতাসে কার্বনের পরিমাণ কমাতে গরু-শক্তি ব্যবহার করা হবে। ব্যাপারটি শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও এমনটি ঘটতে চলেছে আমেরিকাতে। উত্তর আমেরিকায় গোপালন ক্ষেত্র থেকে যত গোবর পাওয়া যায় সেগুলো থেকে মিথেন গ্যাস তৈরি করে এই জৈব গ্যাস দিয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালানো হবে। এতে বছরে বাতাসে প্রায় ১০ কোটি মেট্রিক টন গ্রিন হাউস গ্যাস কম মিশবে। শতাংশের হিসাবে এই পরিমাণটি আমেরিকার প্রতি বছরে বাতাসে মোট গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের প্রায় ৪ শতাংশ। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল ওয়েবার জানাচ্ছেন যে আমেরিকায় বছরে পশুপালন ক্ষেত্র থেকে প্রায় ১০০ কোটি টন মল পাওয়া যায়। হিসেব কষে দেখা গেছে যে এই মল দিয়ে জৈব গ্যাস চালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আমেরিকার মোট শক্তি চাহিদার ১ শতাংশ পাওয়া যাবে। এমনকী এই জৈব গ্যাস শোধন করে নিয়ে রান্না বা ঘর গরম করার কাজও করা যাবে। ওয়েবার জানিয়েছেন যে জার্মানিতে এরকম কিছু জৈব গ্যাস চালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।

উষ্ণায়নে নিস্তার পাচ্ছে না সমুদ্র : উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর সমুদ্রগুলির স্থিতিশীলতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রের জলে এর মধ্যেই উষ্ণতা খানিকটা বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা এর ফলে অগভীর সমুদ্রের জলে, আগামী ২১০০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা আরও প্রায় ৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে এখানকার প্রবালেরা সবচেয়ে বিপন্নতার শিকার হবে। কারণ প্রবালদের দেহে জুজ্যানথেলি নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকায় এরা এত রঙবাহারি হয়। এই জুজ্যানথেলি বেশি উষ্ণতা সহ্য করতে পারে না। জুজ্যানথেলি দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে প্রবালদের শুধু দেহকঙ্কালটি পড়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে ২০৮০ সাল নাগাদ পৃথিবীর সকল প্রবাল দ্বীপের এই দশা হতে পারে। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, পারস্য মহাসাগর ও ক্যারিবীয় সমুদ্রের প্রবালেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কুমেরুর বরফের পরিমাণ কমেই চলেছে : কুমেরুতে ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে এখানকার উইলকিন্স নামের একটি বরফের পাহাড় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সরু সুতোর মতো ঝুলছে। বিজ্ঞানীদের আশংকা যে কোনও সময়ে এটি ভেঙে পড়তে পারে। রিমোট সেন্সিং বিজ্ঞানীরা ২০০৭ সালের জুলাই মাসে উইলকিন্স-এ প্রথম একটি সরু ফাটল লক্ষ করেন। এ বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রীষ্মকালে এই ক্ষেত্র থেকে ৪২ কিলোমিটার লম্বা একটি অংশ ভাঙতে শুরু করে। ফলে মার্চ মাসের দিকে এই বরফের ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৪০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের সমান বরফ কমে যায়। উইলকিন্স বরফ ক্ষেত্রটি কুমেরুর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এটি প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে। গত ৫০ বছরে অঞ্চলটিতে উষ্ণায়নের হার রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উষ্ণায়নের ফলে, গত ৩০ বছরে প্রায় ১০টি প্রধান হিমবাহের ২টি পুরোপুরি গলে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং আরও ৫টি হিমবাহের প্রায় ৬০ থেকে ৯২ শতাংশ বরফ গলে গেছে।

বেচে দেওয়া হল বৃষ্টি অরণ্য : গুয়ানার ইয়োকরামা ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্যের প্রায় ৩৭১,০০ হেক্টর বনাঞ্চল বিক্রি করে দেওয়া হল। ব্রিটেনের একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা **ক্যানোপি ক্যাপিটাল** -এই বনাঞ্চলটি কিনেছে। ইয়োকরামা অঞ্চলটিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। যেমন-জাগুয়ার (নদীতে বাস করা ভোঁদর), অ্যানাকোন্ডা ও বিশালাকৃতির পিঁপড়েখেকো জন্তু বাস করে। ক্যানোপি ক্যাপিটালের ডিরেক্টর জানিয়েছেন যে এই বনাঞ্চল থেকে যে আয় হবে পরবর্তী পাঁচ বছরে তা দিয়ে এখানকার প্রায় ৭০০০ স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবিকা চালানোর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও এই বৃষ্টি অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া হবে বলে দাবি সংস্থাটির।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক : পরিবেশ আকাদেমি, সবুজের অভিযান, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬। সম্পাদক : রাহুল রায়।
যোগাযোগ : ৯৪৩৩৯৪৬১২০; ই-মেল : rayrahul2263@yahoo.co.in